অনুভূতি বিনিময়
কল্পবিজ্ঞানপ্রিয় আমার সকল পাঠককে

আমার কথা

কল্পবিজ্ঞান হল কল্পের বিজ্ঞান মানে যে বিজ্ঞান এখনও আবিষ্কৃত হয়নি; যা এখনও রয়েছে কল্পনার স্তরে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের এমন একটি কল্পনা আজকের দিনে যেটা কল্পনা তবে তার থেকেই বিজ্ঞানীরা পেতে পারে একটা ভাবী আবিষ্কারের রসদ। সেদিক থেকে দেখতে গেলে কল্পবিজ্ঞান হল কিছু আগে ভেবে রাখা। সেটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক উভয়ই হতে পারে। তার মানে যেমন তার থেকে মানুষের আশার পূর্তি ঘটতে পারে তেমনি তা হয়ে উঠতে পারে আশঙ্কার কারণও।

এটা ঠিক যে কল্পবিজ্ঞানে বিজ্ঞানের ছোঁয়া থাকে। কিন্তু থাকতেই যে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দেয়? বিজ্ঞান জিনিসটা তখনই বিজ্ঞান যখন সে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। প্রমাণের দ্বারা সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। আগেই যদি কেউ কিছু কল্পনা করে থাকে সে সাধারণের কাছে যতই উদ্ভট বা অসাধ্য লাগুক না কেন, বিজ্ঞনীরা কিন্তু তাকে আজগুবি বলে উড়িয়ে দেন না। তারা পড়ে থাকেন এই উদ্ভট কল্পনারই পিছনে। ‘একই গাছে অনেক রকম ফল’ এককালে এ তো কল্পনাই ছিল। এই কল্পনার পেছনে আদৌ কোনও বিজ্ঞান আছে কি না অথবা থাকতে পারে কি না সেটা কেউ ভেবে দেখেনি বা দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি। আজ কিন্তু বিজ্ঞান তাকে সত্যি করে তুলতে সমর্থ হচ্ছে। তাই আজ যা কল্পনা, কাল বিজ্ঞান তাকেই হয়তো করে তুলবে বাস্তব।

একটা কথা মনে রাখতে হবে আজকের দিনে আধুনিক সমাজ যেমন নিত্য নতুন বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাহায্য গ্রহণ করছে তেমনি তা গ্রহণ করছে অপরাধীরাও। আর তারা গ্রহণ করছে ভীষণ চতুরতার সঙ্গে। তাই পুলিশ বা গোয়েন্দারা পর্যন্ত বিজ্ঞানকে পিছনে ফেলে চলতে পারছে না। বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এখন পুলিশ আর অপরাধীদের সঙ্গে চলেছে বেশ

দারুণ প্রতিযোগিতা। এক ভয়ংকর লুকোচুরি।

বর্তমান কাহিনিটি পড়লে অনেকের মনে হতে পারে অপরাধী বা গোয়েন্দাদের কিছু বিজ্ঞানের ধারণা বা ব্যবহার শুধুই উদ্ভট কল্পনা। কিন্তু একদিন হয়তো এটা সত্য হয়েও উঠতে পারে তো? পুলিশ যদি আগে ভাগে না জানে তবে অপরাধী তো বেশ কয়েক কদম এগিয়ে যেতে পারে? আর নাকাল হতে পারে দেশের সাধারণ লোক।

কালাযাদুর মতোই ভয়ংকর আর ক্ষতিকর হল অপবিজ্ঞান বা occult science. যে বিজ্ঞান মানুষের ভালো করে তারই অপব্যবহার করে মানুষের ক্ষতির কাজে লাগাচ্ছে দুষ্কৃতিরা।

আজকের দিনে গোয়েন্দাদের অনেক কিছু জানতে হয় আর জানতেই হয়। অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ দুটি জিনিসের সম্পর্ক। এক, আইন আর দুই, চিকিৎসা বিজ্ঞান। এই দুই বিভাগ ছাড়াও অন্যান্য বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে যেমন হাতিয়ার করে অপরাধীরা তেমনি সেগুলোকে হাতিয়ার করতে হয় গোয়েন্দাকেও।

আমাদের গোয়েন্দা সঞ্জয় সেন এই সমস্ত বিষয়েই তুখোড়। আর তার স্নেহের ভাইপো সুমন সঠিক ভাবে তার কাকার অনুসারী। আর তার বয়েসের অনুপাতে খুবই বেশি তৎপর। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সেও কাকার স্থান গ্রহণ করতে পারবে।

আমরা সেই জন্যে অপেক্ষা অবশ্যই করব কিন্তু তার আগে পড়ে নেব তাদের রোমহর্ষক তদন্ত কাহিনিগুলো। বর্তমান কাহিনি যার মধ্যে আকর্ষণীয় একটি।

গাঁতির বাগান, বৈদ্যবাটী।
১৫.০১.২০২৫

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

রোমহর্ষক ব্যাংক ডাকাতি। প্রকাশ্য দিবালোকে বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে ব্যাংকের সুরক্ষিত ভল্ট থেকে কুড়ি লাখ টাকা লুঠ। একজন খুন। সে হল ব্যাংকের সিকিউরিটি গার্ড।

"আশ্চর্য কী জানেন মিঃ সেন, একজন মাত্র লোক একটা মাত্র বন্দুক দেখিয়ে এত টাকা ডাকাতি করে নিয়ে গেল এ যেন রীতিমতো স্বপ্ন। কিংবা অবিশ্বাস্য এক কল্পনা। সিকিউরিটি গার্ড তখন একটু আড়ালে ছিল। সেটাই তার জায়গা। একটু আড়াল থেকেই সে গেট নজরে রাখে। ডাকাতটা যখন বন্দুক দেখিয়ে ক্যাশিয়ার আর ম্যানেজারকে দিয়ে ভল্ট খোলাচ্ছে তখন পেছন থেকে সে তার বন্দুক তাক করেছিল। উদ্দেশ্য হঠাৎ গুলি ছুঁড়ে ডাকাতটাকে ঘায়েল করা। সে একজন এক্স সার্ভিস ম্যান মানে আগে মিলিটারিতে কাজ করত। খুবই দক্ষ লোক। কীভাবে শত্রু জব্দ করতে হয় সেটা তার বিলক্ষণ জানা।"

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সঞ্জয় সেন চোখ বুজে শুধু শুনে যাচ্ছিল আর দুঁদে পুলিশ অফিসার মিঃ রক্ষিত বলে যাচ্ছিলেন। তাঁর বর্ণনা এত স্পষ্ট আর নিখুঁত হয় যে শ্রোতার মনে হয় সে কান দিয়ে শুনছে না চোখ দিয়ে দৃশ্যটা দেখছে। তাছাড়া সঞ্জয় যখন শোনে তখন সে বেশ মনোযোগ দিয়েই শোনে।

"প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছে লোকটার পেছনে যেন দুটো চোখ আছে এমনি ভঙ্গিতে সে সাঁ করে ঘুরেই গুলি করল। আর গার্ড ঢলে পড়ল মৃত্যুর মুখে। এত আচম্বিত আর আকস্মিক ছিল ঘটনাটা যে গার্ড মাটিতে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ বিন্দুমাত্র টের পায়নি।"

"স্ট্রেঞ্জ!" এতক্ষণে কথা বলল সঞ্জয়।

"আর অদ্ভুত জিনিসটা কী জানেন মিঃ সেন?"

ইনস্পেকটরের কথায় ভ্রূ কুঁচকে উঠল বটে ডিটেকটিভ সঞ্জয়ের। তবে চোখ তিনি খুলল না। মিঃ রক্ষিত বলে চললেন, "হাসপাতালে গিয়ে লোকটার

গায়ে কোথাও গুলি খুঁজে পাওয়া গেল না। এমনকি একটা আঁচড়ের দাগও নয়।"

"তবে মারা গেল কী করে?" চোখ খুলে গেল সঞ্জয়ের। প্রশ্নের তির সোজা মিঃ রক্ষিতের দিকে।

"পি এম মানে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে লোকটা নাকি শক পেয়ে হার্ট ফেল করে মারা গেছে। গুলিতে নয়। অথচ..."

"অথচ?"

"দেখুন প্রত্যক্ষদর্শীরা সবাই দেখেছে সেই অদ্ভুত আততায়ীর হাতের বন্দুক থেকে আগুন, শব্দ আর ধোঁয়া উঠতে। এতগুলো লোক এত সিরিয়াস ঘটনায় ভুল তো ব্যাখ্যা দিতে পারে না মিঃ সেন?"

"হয়তো তারা ঘাবড়ে গিয়ে থাকবে। ঠিকমতো বলতে পারেনি?"

"তা হতে পারে না মিঃ সেন। শব্দকে কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। ব্যাংকের বাইরের রাস্তা থেকেও বন্দুকের আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল।"

সঞ্জয় সেন চিন্তার জন্যে আবার চোখ বুঝল। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়। সামান্য একটু পরেই আবার খুলল।

"হ্যাঁ বন্দুক থেকে গুলি ছোড়া হয়েছে না হয় স্বীকার করলুম। হয়তো গুলিটা দিকভ্রষ্ট হয়ে লেগেছে অন্য কোথাও। আর লোকটা সত্যিই শক পেয়ে হার্ট ফেল করে মারা গেছে।" সঞ্জয় বলল।

ইনস্পেকটর বললেন, "আপনার সে সম্ভাবনার কথাও মাথায় এসেছিল। সেক্ষেত্রে লোকটির আশেপাশে কোথাও না কোথাও যেমন ধরুন দেয়াল, আলমারি বা টেবিল চেয়ার মেঝে বা এমন অন্য কিছুতে গুলি তো বিঁধে থাকার কথা।"

কথা না বলে চোখ বুজেই সম্মতির ঘাড় নাড়ল সঞ্জয়।

"কিন্তু আমরা ইনভেস্টিগেশনে তেমন কিছুই পাইনি। কোথাও কোনও আঁচড় পর্যন্ত নেই। অথচ সবাই বলছে গুলির আওয়াজ সবাই শুনেছে আর দেখেছে বন্দুকের মুখ থেকে ওঠা ধোঁয়াও। গুলির আওয়াজ বাইরে রাস্তা থেকেও নাকি শোনা গেছে। সকলের এমন কী স্বার্থ আছে যে তারা মিথ্যে বলবে?"

আবার একটা নীরবতা।

"আপনি কি একবার স্পটে যাবেন মিঃ সেন? গেলে ভালো হয়। সত্যি বলতে কী জানেন আমি এমন কেস জীবনে কখনও পাইনি। ব্যাংকের ওই শাখা

আপাতত আমরা সিজ করে দিয়েছি। ভালো করে ফরেন্সিক এক্সপার্ট দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তবে চালু করতে বলব। সব স্টাফ, কাস্টমার আর অন্যান্য যারা উপস্থিত ছিল সেদিন সব জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। এমনকি বাইরে রাস্তায় সেদিন যারা ছিল বা কাছাকাছি দোকান টোকান অফিস সব।”

“বেশ আমি একটু পরে যাচ্ছি। আপনাকে আগে ফোন করে নেব কেমন?”

“অনেক ধন্যবাদ মিঃ সেন। আমার গা থেকে জ্বর একটু নামল মনে হচ্ছে।”

হাসল সঞ্জয়, “যা কেস তাতে জ্বর হয়তো ছাড়তে একটু দেরি লাগতে পারে মিঃ রক্ষিত। আর কতটা জলপটি দিতে হবে তাও ঠিক করে বলতে পারছি না।”

ইনস্পেকটর মিঃ রক্ষিত বেশ জোরে হেসে উঠে বললেন, “আপনি বেশ মজার মানুষ যা হোক। এইরকম সিরিয়াস সময়েও রসিকতা করতে ছাড়েন না। আমি তবে যাই এখন। অপেক্ষা করছি আপনার জন্যে।”

“তাই করুন মিঃ রক্ষিত। যাব বলেছি যখন, তখন যাব তো বটেই। তা ছাড়া আপাতত আমার হাতে জরুরি তেমন কোনও কেস নেই।”

দুই

ইনস্পেকটর মিঃ রক্ষিত চলে যেতে ভাবতে বসল সঞ্জয়। ভাইপো সুমন এতক্ষণ ও ঘরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। পুলিশের কেউ কাকুর সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করলে এ ঘরে ঢোকা তার বারণ। কারণ এই সব আলোচনা হাই সিকিউরিটির ব্যাপার। সুমন যতই নিজের লোক হোক তার সামনে নিজের কোনও আত্মীয়কে হাজির করে নিজের ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে চায় না সঞ্জয়। তার ক্ষমতার প্রকাশ তার দক্ষতায় আর কর্তব্যনিষ্ঠায়। এখন বেরিয়ে এসে সুমন বলল, “কাকু এমন কি হয় নাকি গো? গুলি করল অথচ সে গুলি বিঁধল না কোথাও? ভূতুড়ে বন্দুক নাকি?”

সামান্য হেসে সঞ্জয় বলল, “এ জগতে কী হয় আর কী না হয় তার কি কোনও ঠিক আছে সুমন? উন্নত বিজ্ঞানের কৃপায় সব কিছু হয়। এককালে মানুষ বলত হাতের মুঠোর একটা যন্ত্রের মধ্যে সারা জগতকে বন্দি করে রাখা আর দরকার মতো তাকে খুলে খুলে দেখা অসম্ভব। কিন্তু আজ কি সেটা তাই? বল না এই মোবাইল স্মার্ট ফোন আবিষ্কারের পর বিজ্ঞান মানুষকে কোন দরজার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে দেখ?”

অবাক হয়ে ভাবছিল সুমন। সঞ্জয়ের অমন ব্যাখ্যা সত্ত্বেও ব্যাপারটা যেন তার বোধগম্য হচ্ছিল না। তাই চুপ করে রইল। কিন্তু বিষয়টা সে তার মাথায় ঢোকেনি আর আরও ব্যাখ্যা চায় সেটা বুঝল সুমন। আর সঞ্জয় মুখ খুলল আবার তাই।

"হয় অবশ্য", ভাবতে ভাবতে বলল সঞ্জয়, "ভূতুড়ে বন্দুক না হলেও হয়।"

সুমন অবাক হল, "সেটা কী করে কাকু?"

"একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় আসছে। ধর যদি বুলেটটা বরফের হয়?"

"বরফের বুলেট!" চোখ সাংঘাতিক রকম বড়ো বড়ো করে সুমন জিজ্ঞেস করল, "তেমন হতে পারে কাকু? কই আমি তো তেমন কিছু শুনিনি?"

সঞ্জয় হাসল, "কত না শোনা আর না জানা কথাই তো আগামী সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সুমন। আজ যা অজানা কিংবা যা নিয়ে মানুষের চোখ ছানাবড়া হচ্ছে আগামী কাল হয়তো সেটাই তার জানা হয়ে যেতেও পারে। কী বল? বিজ্ঞানের কত আবিষ্কার আগে ছিল না কিন্তু এখন তো হয়ে গেছে নাকি? একটু আগেই তো আমি সেই ব্যাখ্যাই করলুম তোর কাছে নাকি?"

সুমন তবু সন্তুষ্ট হল না। সে বলতে চেষ্টা করল, "কিন্তু বরফের বুলেট…"

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সঞ্জয় বলল, "আসলে সবই হচ্ছে বিজ্ঞানের খেলা। বরফকে তার হিমাঙ্ক থেকে অনেক কমিয়ে আনলে মানে জিরো ডিগ্রির অনেক নীচে নামিয়ে আনলে বরফ প্রচণ্ড শক্ত হয়ে যায়। ডিফ ফ্রিজে দেখিসনি অনেক সময় আইস ট্রে থেকে বরফ ছাড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে মারাত্মক শক্ত বলে। আর সেই বরফ দিয়ে বানানো যেতে পারে বরফের বুলেট।"

কাকু তো ঠিক কথাই বলছে। সুমন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

"কিন্তু ধরো, বানানো গেল এমন কিছু বুলেট।" সুমন জিজ্ঞাসা করল, "সেটা ছোঁড়া হবে কী করে? বন্দুক ছুঁড়লে সেটা তো গরম হয়ে যাবে কাকু আর তা হলে বরফ তো গলে যাবে? সেটা আর মানুষের শরীরের ভেতরে ঢুকবে কী করে?"

সঞ্জয় ভেবে বলল, "এটা তুই ঠিক বলেছিস। তবে বন্দুক গরম হয় কারণ তাতে বারুদ থাকে বলে। ট্রিগার সেই বারুদের ওপর পড়ে বারুদ থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় গ্যাস তৈরি হয়। এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটার জন্যেই বন্দুক গরম হয়। খেলনা বন্দুকে ক্যাপ ফাটালেও বন্দুক গরম হয়। এখন বন্দুকের ছোট্ট সেই নলে প্রচুর গ্যাস একসঙ্গে থাকতে পারে না। তারা প্রচণ্ড জোরে বাইরে

বেরিয়ে আসতে চায়। আর সেই চাপে গুলিটাও জোরে বেরিয়ে আসে।”

“তার মানেই বোঝো কাকু। বারুদ ছাড়া তো আর গুলির গতি আসবে না। আবার বারুদ ফাটলে যে উত্তাপ তৈরি হবে তাতে তো বরফের বুলেট গলে যাবে।”

ভাইপোর বুদ্ধিতে খুব খুশি হল সঞ্জয়। বলল, “একেবারে ঠিক বলেছিস। কিন্তু এই গতি বারুদ না ফাটিয়েও তো হতে পারে? বল তো আগেকার দিনে যখন বন্দুক ছিল না কিন্তু সামান্য তির ছুড়ে কত দূরের জিনিস ঘায়েল করা যেত? ধনুকের ছিলের কি কম জোর?”

“হ্যাঁ কাকু, এখানে স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হচ্ছে।”

“কিংবা ধর গুলতি? সেখানেও কি বারুদের কোনও কারবার আছে? আর ধনুক বা গুলতিকে কি তেমন গরম হতে দেখেছিস? আরও উদাহরণ আছে। যেমন ধর একটা স্প্রিংকে ছোটো করে ছেড়ে দেওয়া হল। এটা কী প্রচণ্ড গতিতে জিনিসটাকে দূরে ছুঁড়ে দিতে পারে বল? তাই কিছু ছোঁড়ার জন্যে বারুদ সর্বদাই তেমন আবশ্যক নয়।”

কাকুর কথাগুলো অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল সুমন। সত্যি তো তির ধনুক আর গুলতি বা স্প্রিং-এর কথাটা তার মনেই আসেনি একেবারে। আসলে কাকু তার চেয়ে কত বড়ো বয়সে। বয়স একটা ব্যাপার বটে জ্ঞান অর্জনের।

“তা ধর, বানানো হল এই বরফের গুলি ছোঁড়ার জন্যে উপযুক্ত বন্দুকও। সেটা অসম্ভব তেমন কিছু নয়। আর ছোঁড়াও হল। তাহলেও শরীরের ভেতরে গুলিটা কেউ পাবে না।”

“পাবে না? কেন কাকু?”

“কারণ শরীরের ভেতর গিয়ে শরীরের তাপে সে গুলি গলে জল হয়ে যাবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তো...” বলতে বলতে আবার একটা গভীর ভাবনায় ডুবে গেল সঞ্জয়।

“সেক্ষেত্রে কী কাকু?”

তার ভাবনার রাজ্য থেকে যেন ফিরে এল নিজের রাজ্যে সঞ্জয়, “সেক্ষেত্রে শরীরে একটা ফুটো থাকবে। কারণ বুলেট বরফের হলেও সে চামড়া না ফুটো করে শরীরে ঢুকবে কী করে বল? এটাকে বুলেট ইনজুরি ওপেনিং বলে। বুলেট আবার যদি শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তবে সেখানেও একটা ছিদ্র থাকতে বাধ্য যাকে বলে ইনজুরি একজিট। যে ধরনের বুলেটই হোক শরীরে সেই বুলেট ঢোকার একটা অন্তত ছিদ্র তো থাকবেই। শরীরের ভেতরে ঢুকে বুলেট গলে

জল হয়ে অদৃশ্য হলেও চামড়ার ছিদ্র তো আর অদৃশ্য হতে পারে না। একজিট না থাকলেও ওপেনিং তো থাকতেই হবে।"

সুমন বুদ্ধিমানের মতো বলল, "ঠিক কাকু না হলে গুলিটা ঢুকবে কী করে?"

"কিন্তু..."

"কিন্তু কী কাকু?"

"কিন্তু মজার কথা এই যে তার দেহে নাকি একটা আঁচড় পর্যন্ত নেই। মিঃ রক্ষিত তাই বলছেন। হাসপাতাল যখন পরীক্ষা করেছে তখন তার মধ্যে ভুল থাকবে এটা তো হয় না। পোস্টমর্টেমের সময় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় দেহের সব কিছু। এতে ভুল হবার তেমন উপায় নেই। কারণ দরকার হলে এগুলো আদালতের কাছে ব্যাখ্যা করতেও হতে পারে। আর দরকার তো হয়ই। যে কোনও খুনের কেস কোর্টে উঠল তদন্তকারী পুলিশ অফিসার তো বটেই, সাক্ষ্য দিতে হয় পোস্টমর্টেম যিনি করেছেন সেই ডাক্তারকে; ফরেন্সিক বিশ্লেষণ যিনি করেছেন সেই বিশেষজ্ঞকে। আর গুলি গোলার ব্যাপার হলে আসবে ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞ। এই বিভাগকে বলে ব্যালিস্টিক বিভাগ।"

সুমন মাথা নাড়ল, "না কাকু, আমার মনে হয় গুলি-গোলা বা ছুরি-ছোরা এসব কিছুই নয়।"

সুতরাং তাদের চিন্তার সূত্র থেকে বাদ গেল বরফের বুলেট তত্ত্ব।

তিন

সঞ্জয়ের প্রিটেস্ট পরীক্ষা সামনে। তাকে তো পড়তে বসতেই হবে। কিন্তু পড়তে বসেও এই কেসটার কথা ভাবতে লাগল। কেমন যেন উদ্ভট লাগছে সব ব্যাপারটা। যদিও তার কাকু সঞ্জয় সেন বিরাট ডিটেকটিভ আর সে মাথা খাটিয়ে ঠিক বার করে ফেলবে এর সমাধান। কিন্তু যতক্ষণ না সেটা হচ্ছে ততক্ষণ তার মাথার ভিতর কে যেন আঁচড় কেটে চলেছে। কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে দিচ্ছে না।

যদিও পড়ার সময় তার অন্য কিছু করা বারণ কাকুর ধমকানি খেতে হয় তবু কৌতূহল তার কিছুতেই বাগ মানছে না। গুটি গুটি এসে হাজির কাকুর ঘরে। গভীর চিন্তায় ডুবে থাকা কাকু তাকে দেখে অবশ্য বিরক্ত হল না বা পড়া ছেড়ে কেন উঠে এল সেটা জানতেও চাইল না। তার পায়ের শব্দে মুখ তুলে শুধু বলল,

"তুই এসেছিস? আচ্ছা বোস।"

সুমন চুপ করে বসে রইল। এখন কাকু গভীর চিন্তা করছে। প্রশ্ন করে তাকে বিরক্ত করা ঠিক নয়।

একটু পরে সঞ্জয় নিজে থেকেই বলল, "কিন্তু প্রশ্ন হল দুটো। বন্দুকে আওয়াজ হয়েছে মানে তার থেকে বুলেট বেরিয়েছে..."

বাধা দিল সুমন, "সেটা কী করে নিশ্চিত হচ্ছ কাকু? যখন ব্ল্যাংক ফায়ার হয় তখনও তো গুলি বেরোয় না কিন্তু শব্দ আর ধোঁয়া দুটোই বেরোয়?"

"কারেক্ট।" ভাইপোর পিঠ চাপড়াল সঞ্জয়, "এই পয়েন্ট আমার মাথায় কেন এল না তাই ভাবছি। কিন্তু যেহেতু একজন মারা গেছে তাই ব্ল্যাংক ফায়ারের তত্ত্ব সরিয়ে রেখে যদি ধরা যায় গুলি ছোঁড়া হয়েই থাকে তো সেটা গেল কোথায়?"

একটু চুপ করে ভাবল সঞ্জয়। সুমন জানে কাকু তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে তখনই যখন সে তার ভাইপোকে তার ভাইপো না ভেবে উপযুক্ত সহকারী ভাবে। কথাটা ভাবতেই সে শিহরিত হয়ে ওঠে।

সঞ্জয় আবার শুরু করে, "আবার সে বুলেট যেমন শরীরে নেই তেমনি ব্যাংকের মেঝে, দেয়াল বা আলমারি-আসবাবেও নেই? তবে প্রশ্ন এক, বুলেট কোথায় গেল? প্রশ্ন দুই, বুলেট যদি তার শরীরে না ঢোকে তো লোকটা মরল কীসে?"

"কিন্তু কাকু লোকটা যে মরেছে এটা তো ঠিক। পোস্টমর্টেম করে ডাক্তারবাবুরা বলেছেন এ কথা যখন। কেমন যেন ভৌতিক ভৌতিক গন্ধ কাকু।"

এলিয়েনের কথাটাও তার মাথায় এসেছিল। কিন্তু সেটা বলল না। ভয়ে ভয়ে নিজের মনের মধ্যেই রেখে দিল। এলিয়েনের কথায় কাকু একেবারে জ্বলে যায় যেন। অন্য সময় হলে ভূতের কথায় খুব রেগে গিয়ে ধমকাতো সঞ্জয়। কিন্তু এখন চিন্তায় এমন জড়িয়ে রয়েছে যে সুমনের কথায় ডাইভার্ট করতে মন চাইল না। ওদিকে মন ঘুরে গেলে এদিকের চিন্তার গভীরতা কমে যাবে। চিন্তাচ্ছন্ন ভাবে বলল, "আর আশ্চর্য দেখ, পিএম বলছে সিকিউরিটিগার্ড হার্ট ফেল করেছে। সেটা যদি গুলি খেয়ে না হয় তো শব্দের চোটে মরেছে ধরতে পারি। মানে উচ্চ শব্দে হার্ট ফেল করে।"

"হ্যাঁ ঠিক কাকু, খুব কাছে বাজি ফাটলে আমারও কেমন বুকটা ধড়াস ধড়াস করে ওঠে।"

"তা হতে পারে বটে। কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ তো সবাই শুনেছে। সেটা

এত জোর ছিল যে বাইরে রাস্তা থেকেও শোনা গেছে। অবাক করা বিষয় হল এই যে সেই শব্দে কেউ হার্ট ফেল করল না শুধু ঐ সিকিউরিটি গার্ড ছাড়া। গুলি ছোঁড়ার আওয়াজেই যদি সে হার্ট ফেল করে তো সেখানে আরও অনেকেই তো সে আওয়াজ পেয়েছিল?"

আওয়াজের কথায় আবার একটা খটকা লাগল সুমনের মাথায়। ইনস্পেকটর কাকু আবার শব্দের সঙ্গে ধোঁয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ধোঁয়া আসে তো আগুন থেকে। আর বন্দুকে আগুন আসে তো বারুদ থেকে।

"আমার মনে হয় কাকু..." বলে সে চুপ করে গেল।

"থামলি কেন বল?"

"আমার মনে হয় এই বন্দুকেও বারুদ ছিল। না হলে শব্দ আর ধোঁয়া কী করে বেরোবে বলো?"

সঞ্জয় হেসে বলল, "আমি জানি।"

অবাক হয়ে সুমন বলল, "তুমি জানো? কই বলোনি তো?"

"আমি জানলেই বা সব তোকে বলব কেন? তোকে নিজে ভাবার সুযোগ আমি কেড়ে নেব কেন বলতে পারিস?"

শুনে বেশ খুশি হল সুমন। তার মানে তার কাকু তাকে বেশ সমঝদার বলে ভাবে। "আচ্ছা কাকু যদি তাই হয়, তবে বন্দুকের ভেতরের গরমে বরফের গুলি গলে যায় না কেন?"

"সেই গরমের স্পর্শে কতটুকু থাকে বল তো গুলিটা? একটা সেকেন্ডের মাত্র কয়েক ভাগ। একটা বরফ গলতে তো কিছু সময় লাগে? তা ছাড়া বরফে সেই পরিমাণ তাপ পৌঁছতেও তো কিছু সময় লাগে নাকি?"

সুমন আর কথা বলল না। চুপ করে ভাবতে লাগল একটা ডিটেকটিভকে কত কিছু ভাবতে হয়। একই ঘটনার কতগুলো সম্ভাবনার আগাম আঁচ করতে হয়। বাবারে বাবা। এর থেকে তার অংকের বইয়ের অংকগুলো অনেক সহজ।

সঞ্জয় গম্ভীরভাবে খানিকটা যেন নিজের মনেই বলে চলল, "হুঁ, তাইতো ভাবছি। যারা সিকিউরিটিগার্ড হয় তাদের হার্ট তো এত দুর্বল হয় না যে সামান্য একটা গুলির শব্দে হার্ট ফেল করবে। গুলি-গোলা নিয়েই তো কাজ তাদের। আর এই লোকটা তো এক্স-সার্ভিস ম্যান ছিল। মানে যুদ্ধক্ষেত্রে গুলিগোলার জায়গায় কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। সেখানে তো কতদিকে একসঙ্গে কতগুলো গুলিগোলা, বোমা, মর্টার এসব ফাটছে। এক্ষেত্রে বরং সিকিউরিটি গার্ড ছাড়া অন্য লোকেদেরই হার্ট ফেল করার কথা।"

"হয়তো লোকটার হার্ট আগে থেকেই খুব দুর্বল ছিল। হার্টের কোনও রোগ থাকতে পারে।"

সুমনের কথায় সঞ্জয় বলল, "হতে পারে আবার নাও পারে। তবে ব্যাংকের সিকিউরিটি গার্ড হতে গেলে তো উপযুক্ত মেডিক্যাল পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে হয়। আর আগে থেকে এমন রোগ থাকলে ব্যাংক তাকে চাকরি দেবে কেন বল?"

সুমন আর কী বলবে। এত বিস্তারিত সে তো জানে না। সে শুধু তার নিজস্ব ভাবনা চিন্তা দিয়ে সন্দেহটা প্রকাশ করতে পারে। কাকুর মতো জ্ঞানবুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা তো তার নেই।

"কিন্তু এ দেখছি এক মস্ত ধাঁধায় পড়া গেল। প্রফেসরের খুনটার কোনও কিনারা হল না এর মধ্যেই এই ঝামেলা।"

"প্রফেসরের কোন কেসটা কাকু? প্রফেসর মহাপাত্র?"

"হ্যাঁ তুই ঠিক ধরেছিস।"

প্রফেসর মহাপাত্রের কেসটা মনে এসে গেল সুমনের। কাকুর মুখে শুনেছে এটা বড়ো বেয়াড়া কেস।

"আচ্ছা কাকু পুলিশ কি কিছুই করতে পারে না সব তোমার ঘাড়ে ঠেলে দেয়?" বেশ একটু বিরক্ত হয়েই কথাটা বলল সুমন।

ভাইপো সুমনের কথায় কিন্তু বেশ গর্ব অনুভব করল সঞ্জয়। হেসে বলল, "কেসগুলো খুব কমপ্লিকেটেড কিনা। বড্ড জটিল। জটিল কেস ছাড়া ওরা আমার কাছে আসবে কেন বল? পুলিশ তো নিজেই সলভ করে ফেলতে পারে? এই যে প্রফেসরের মৃত্যুটা কী সাংঘাতিক রহস্যে মোড়া বল। প্রফেসর মহাপাত্রের মতো নিপাট ভালোমানুষকে মারার কার কী প্রয়োজন হতে পারে বুঝতে পারছি না। অমন ঠান্ডা মানুষ। সাতে নেই পাঁচে নেই। তার ওপর রাগ থাকাটা কার পক্ষে সম্ভব?"

সুমন ধীরে ধীরে বলল, "হয়তো কোনও অজানা কারণ? যা আমরা কেউ জানি না কিন্তু যে খুন করেছে সে একমাত্র জানে?"

"এক্সেলেন্ট! বড়ো হয়ে তুই গোয়েন্দা না হয়ে যাবি না।"

একটু লজ্জায় পড়লেও বেশ গর্ব অনুভব করল সুমন।

চার

বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙে প্রফেসর মহাপাত্রকে উদ্ধার করা হয়েছে তিনদিন আগে। তবে জীবিত নয় মৃত অবস্থায়। তিনি একাই থাকতেন। বিয়ে করেননি, অকৃতদার। একজন ঠিকে লোক আছে রোজ সকালে এসে বাড়ির কাজ করে দিয়ে যায়।

সেদিন অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করে সাড়া পায়নি কাজের লোকটা। প্রথমে ভেবেছিল বয়স্ক মানুষ রাতে হয়তো ঘুম আসতে দেরি হয়। তাই শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু শেষে পাড়ার লোক জড়ো করে চিৎকার আর বিরাট হল্লা করেও যখন কিছু হল না তখন দরজা ভাঙা হয়েছে। তখনও ভাবা হয়েছিল ভদ্রলোক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অথবা অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন আর তাই উঠে দরজা খুলে দিতে পারেননি।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে লোকের মনে ডাক্তার ডাকার কথাটাই এসেছে। ডাক্তার এসে বলেছে মারা গিয়েছেন ভদ্রলোক। শ্বাসরোধে মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় অস্বাভাবিক। লোকাল ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট দেয়নি। পুলিশ এসেছে। পুলিশও আন্দাজ করেছে শ্বাসরোধে মৃত্যু। সেইরকম লক্ষণ তারা পেয়েছে। ময়না তদন্তের ফল বলেছে শ্বাসরোধে মৃত্যুই বটে তবে কেউ সজোরে গলা টিপেছে। যদিও তারা গলায় আঙুল বা অন্য কিছুর দাগ দেখতে পায়নি।

এখন তো পুলিশ কাকু মানে মিঃ রক্ষিত নেই। তাই সুমন নির্ভয়ে কথা বলছে সঞ্জয়ের সঙ্গে।

"আচ্ছা কাকু", সুমন জিজ্ঞাসা করে, "ঘরের দরজা যদি বন্ধই থাকে তো ঘরে অন্য লোক ঢুকবে কী ভাবে? গলা টিপতে গেলে তো কাউকে না কাউকে ঘরের ভেতর যেতে হবে বলো?"

সঞ্জয় উত্তর দিল না। সে তখন গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বলল, "আর যদি ঢুকেই থাকে তো সে বেরিয়ে যাবার পরে ঘরের ভেতর থেকে দরজা দিলই বা কে? মারা যাবার পর তো আর প্রফেসর মহাপাত্র উঠে এসে দরজা বন্ধ করতে পারেন না?"

"সুইসাইড নয় তো কাকু?" সুমন বলল।

"না তা নয়।"